(পূর্ববর্তী ইংরেজি রচনার বঙ্গানুবাদ)

শিখ ধর্মের আকরগ্রন্থ —"গুরু গ্রন্থসাহিব" ও বাংলায় তার চর্চা

ঈশা-পূর্ব কালে দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কৃতি তাদের সনাতনত্ব এবং রক্ষণশীলতার কারণে ভারতীয় সমাজকে পরিণত করেছিল একটা অচলায়তনে। মধ্যযুগের ষোলশ বছর আগে বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হলে আবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উৎপীড়ন শুরু হয়। দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে এই বিপর্যস্ত অবস্থা। নাভিশ্বাস উঠেছিল সে সময়ের অর্থাৎ মধ্যযুগের অ-ব্রাহ্মণ, নিম্নতর শ্রেণীর জাতিসত্তার।

ভারতবর্ষের বাইরে এরকম অবস্থার প্রতিকারের প্রয়োজনে ইসলামের আবির্ভাব হয় মধ্যপ্রাচ্যে। ক্রমশ এই নবীন ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে পূর্বদেশে। পবিত্র কোরান এবং হাদিস্-এর কিছু সূক্ত অবলম্বনে সুফি সাধকেরা খ্রীস্টিয় নবম দশম শতকে এক নতুন মতের বিকাশ ঘটান। তাঁদের ভাবনায় –'প্রেম ও ভক্তিই হলো ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র পথ। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে কোনো আচার অনুষ্ঠান, অনুশাসন অপরিহার্য নয়। সুফী সাধকদের এই ভাবনা ভারতবর্ষের 'ভক্তি আন্দোলন'-এর পথিকৃৎদের কমবেশি প্রভাবিত করেছিল। সুফী সাধক শেখ ফরিদ প্রথম যুগের পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর গাথা বা গান লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে গুরু অর্জন দেব তাঁর কিছু গাথা 'আদিগ্রন্থ'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম গুরু রামানন্দের কিছু বাণীও তিনি আদিগ্রন্থে নিয়েছিলেন।

ইসলামের আগ্রাসনের ফলে ধর্মান্তরকরণ, উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ইত্যাদি প্রতিহত করতে এদেশে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ভক্তি আন্দোলন তীব্রতা পায়। রামানুজ প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এর প্রসার ঘটে। রামানন্দ, কবীর, দাদু দয়াল, নানক, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, নামদেব, শঙ্করদেব ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভক্তি আন্দোলনের ধর্মগুরু। ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই এঁরা আবির্ভূত হন না কেন, মত ভিন্ন হলেও পথ ও লক্ষ্য তাঁদের এক ছিল।

ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, শিখধর্মের প্রবর্তক বাবা নানক উপনিষদের একেশ্বরবাদের পুনর্জীবন ঘটিয়েছিলেন। নানক ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী। ১৫ এপ্রিল, ১৪৬৯ সালে লাহোর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে তালবন্দী গ্রামে এক দরিদ্র

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন এই জায়গা তাঁর নামানুসারে হয়েছে নানকানা সাহিব এবং এই জনপদ বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন নানক। তাঁর বাবার নাম ছিল মেহতা কালু এবং মায়ের নাম তৃপ্তা। তিনি গ্রামের শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শৈশবের দিন থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মনিমগ্ন থাকতেন। উচ্চশিক্ষা বা অর্থোপার্জনের প্রতি কোনো আগ্রহই তাঁর ছিল না। এজন্য তাঁর বাবা তাঁকে নিয়ে নিতান্তই অখুশি ছিলেন। তাঁর এই ধর্মপ্রবণতা তাঁর প্রথম জীবন থেকেই প্রকাশ পায়। অল্প বয়সেই সুলখনি-র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় এবং দুটি সন্তানের জনক হন তিনি। সংসারে থেকেও বাবা নানক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হননি। ঈশ্বরচিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। ১৪৮৫ সালে তাঁর ভগ্নীপতির সাহায্যে তিনি দিল্লি সুলতানৎ-এর লাহোরের স্থানীয় প্রশাসকের অধীনে সুলতানপুরে অবস্থিত মোদিখানায় (রাজস্ব-অর্থের পরিবর্ত শস্য ভাণ্ডার) স্টোর-কীপারের চাকরি পান। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ভাবনা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। এই সময়ে তিনি সাধনার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যান, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসেন। এরপর তিনি সুলতানপুরের কাজ ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পথে বেরিয়ে পড়েন। শুরু হয় তাঁর 'উদাসী' ভ্রমণ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় জ্ঞানী, সাধু সন্তদের সাথে কথা বলার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়েছেন। শোনা যায় তিনি ভারতবর্ষের বাইরেও গিয়েছিলেন সাধু সন্তদের খোঁজে। কাবুল তখন সুফী সন্তদের মিলনভুমি। তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন। বিহার হয়ে রাজমহল দিয়ে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। পথে মালদহে জনৈক রামবাবুর বাগানে রাত কাটিয়েছিলেন। সে বাগান এখনও আছে এবং তার নাম এখনও 'গুরু কি বাগ'। এখান থেকে তিনি পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টে যান। উত্তরবঙ্গের শ্রীহট্ট তখন শীর্ষ শিক্ষাপীঠ। সম্ভবত এখানেই তিনি নিমাই পণ্ডিতের নাম শোনেন। নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে তিনি পুরী যাওয়ার পথে কয়েকদিন কাটিয়ে যান কলকাতার সুতানুটি অঞ্চলে। তখন একমাত্র সুতানুটিতে জনবসতি ছিল। তখনও নগর কলকাতার পত্তন হয়নি। সময়টা ছিল আনুমানিক ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দ। ঘন জঙ্গলে ভরা বাঘ, কুমীর আর ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। নানকদেব এখন যেখানে বড়বাজার সেখানে একটা গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম 'বড়ি সঙ্গত সাহিব' গুরুদ্বার। তিনি যে পুরী গিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এরকম কোনো তথ্য চৈতন্যদেবের প্রামাণ্য কোনো জীবনীতে পাওয়া যায় না। তবুও জানা যায় নানক দেব বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করেছিলেন। বাবর ভারত আক্রমণ করলে বাবা নানক শোনা যায় তাঁর সাথেও দেখা করেছিলেন। নানক ছিলেন ধর্ম সংস্কারক, আধ্যাত্মিক চেতনার মানুষ। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন মানুষ। সমকালীন মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁর চোখ এড়িয়ে

যায়নি। তাঁর 'বাবর বাণী' কবিতা গুচ্ছের মাধ্যমে বাবরের সেনাবাহিনীর হাতে নারী ও পুরুষদের পীড়ন এবং নির্যাতনের কথা বাবরকে লিখে পাঠিয়েছিলেন।

নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুর আসাম যাওয়ার পথে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন মোগল আমল। এখানে এসে শিখদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করেন।

নানক বলতেন, 'হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই।' এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা যে একজন মানুষ হয় এই পরিবারে জন্মেছে নয়তো বা অন্য পরিবারে। 'তিনি এমন একটা সমাজের কথা ভেবেছিলেন যেটি তৈরি হবে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের উপর নির্ভর করে, যেখানে জাতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। সুফী সাধকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকলেও সুফী মতাদর্শ তাঁকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারেনি। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু দর্শন তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে। ঋগ্বেদ, উপনিষদ, বিশেষ করে ছন্দোগ্য, মাণ্ডুক্য উপনিষদ, কথা, প্রশ্ন এবং ভগবদগীতা। ব্রাহ্মণ্য মতগুলি তিনি সরাসরি বর্জন করেছেন, তিনি জানতেন জাতিভেদ প্রথা সূচনা হয়েছিল বেদ থেকে এবং পুরান-এর যুগে তার প্রসার ঘটে। খুবই সীমিতভাবে এবং সতর্কতার সাথে তিনি ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব' গুরুমুখী বর্ণমালায় রচিত এক রচনাসংগ্রহ। এই গ্রন্থের দশটি বাণী শিখধর্মাবলম্বীরা অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করেন এবং নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেন। এগুলি হলো —

১) যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করা যায় না, সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও কেউ তা পেরে উঠবে না।

২) যার নিজের উপর কোনো বিশ্বাস নেই তিনি ভগবানকে কিভাবে বিশ্বাস করবেন ?

৩) ঈশ্বর একজনই, আর তাঁর নাম সত্য। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি কাউকে ভয় পান না, কাউকে ঘৃণা করেন না, তিনি জাগতিক জন্ম মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। তিনি স্বীয় দীপ্তিতে আলোকিত হন। একমাত্র প্রকৃত গুরুই তোমাকে তাঁর সন্ধান দিতে পারবেন। এই ঈশ্বর সৃষ্টির শুরুতে প্রাসঙ্গিক ছিলেন। আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং আগামী দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা একটুও কমবে না।

৪) আপনাকে যদি কেউ ভালোবাসে, জানবেন আপনি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন।

৫) পৃথিবী আসলে নাট্যমঞ্চ, আর আমরা সকলে স্বপ্নের মধ্যে এখানে অভিনয় করে চলেছি।

৬) মাংস খাওয়া উচিত নাকি সব্জি, এসব নিয়ে মূর্খেরা তর্ক করে ! কোনটি মাংস এবং কোনটি সব্জি কে ঠিক করে দিয়েছে ? আর কোনটি খেলে পাপ হবে, সেটাই বা আসলে কে জানে !

৭) যদি মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ সত্যি কেউ জানতে পারে তাহলে সে আর মৃত্যুকে ভয় পাবে না।

৮) যে সব মানুষকে একই মনে করে, সেই প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

৯) ঈশ্বর তোমাকে যে ধনসম্পত্তি দিয়েছেন, তা' যদি তুমি শুধু নিজের বলেই আগলে রাখো, তা হলে তা' একটি শবের চেয়েও পূতিগন্ধময়, কিন্তু তা' যদি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নাও, তাহলে পবিত্র প্রসাদের চেয়েও বেশি পুণ্য বলে ধরা হবে।

১০) তোমার কথা শুনে অন্যরা যেন তোমাকে সম্মান করতে পারে। এমন কথাই সব সময় বোলো।

মানব সভ্যতায় ধর্মের ইতিহাসে যে সব আকর গ্রন্থ আছে তার মধ্যে শিখ ধর্মের 'বাবা গ্রন্থ সাহিবজী' অন্যতম একটি সারগ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি গুরুমুখী বর্ণমালায় এবং আঞ্চলিক ও অন্যান্য ভাষায় সংকলিত হয়েছে। এইসব আঞ্চলিক ও অন্যান্য ভাষা 'সন্ত ভাষা'-র মোড়কে স্বতন্ত্র পরিচয়লুপ্ত হলেও পাঞ্জাবী, আঞ্চলিক পাঞ্জাবী, সিন্দি ইত্যাদি ভাষায় এই সারগ্রন্থ লেখা হয়েছিল এ কথা জানা যায়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। শুধু পাঞ্জাবীরা নন, শিখধর্মের অনুসারী বিভিন্ন ভাষার মানুষ সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। বাঙালিদের মধ্যে এই সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয়। এই সম্প্রদায়ের বাইরে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই সার গ্রন্থের মর্ম আত্মস্থ করেছেন এবং গ্রন্থটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন।

গুরু নানকের সমস্ত বাণী এবং কথা গুরু গ্রন্থসাহেব-এ বর্ণিত হয়েছে এবং সংরক্ষিত আছে। এই সুবিশাল গ্রন্থে চৌদ্দশ ত্রিশটি 'অঙ্গ' বা পৃষ্ঠা আছে এবং পাঁচ হাজার আটশ চুরানব্বইটি 'শবদ' বা পঙ্‌ক্তি আছে। উত্তর ভারতীয় মার্গ সংগীতের একত্রিশটি রাগের মাত্রা ও সুরের বাঁধনে গ্রন্থসাহিবের বেশির ভাগ অংশ বাঁধা। শুধু গুরু নানক নন, রামানন্দ, কবীর, নামদেব ইত্যাদি চৌদ্দজন ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের ধর্মগুরুর শাশ্বত বাণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুসলমান আক্রমণের আগের বাঙালি কবি জয়দেবের কাব্য এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে। সুফী সন্ত শেখ ফরিদের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। গ্রন্থটি গুরুমুখী হরফে লিখিত। প্রধানত পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহৃত হলেও এই সারগ্রন্থে ব্রজ, খড়িবোলি (হিন্দি), সংস্কৃত, ফার্সি এবং বিভিন্ন স্থানীয় উপভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। গুরু গ্রন্থসাহিব-এর ভাষাকে সন্ত ভাষা বলা হয়।

১৪৬৯ থেকে ১৭০৮ সালের অন্তর্বর্তীকালে ছয়জন শিখগুরু এই গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ দেব গুরুমুখী লিপি আবিষ্কার করেন এবং গুরু নানকের বাণী ও উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করেন। পঞ্চম গুরু অর্জন দেব প্রথম পাঁচ শিখগুরু এবং হিন্দু ও মুসলমান সন্তসহ বিভিন্ন মহান সন্তের রচিত স্তোত্রাবলি থেকে রচনা নির্বাচন করে ২৯ আগস্ট, ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'আদিগ্রন্থ' সংকলন করেন। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ এবং অর্জন দেব ব্যতীত গুরু অমর দাস, রামদাস এবং

গুরু তেগবাহাদুরের রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গুরু তেগবাহাদুরের একশো পনরোটি গান এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তির কাজটি করেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং। তিনিই ১লা সেপ্টেম্বর এই পবিত্র গ্রন্থ প্রথম অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে স্থাপন করলেন। স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মুসলমান সন্ত মিয়া মীর। উল্লিখিত ছ'জন শিখ গুরুর পাশাপাশি পনরো জন হিন্দু ও মুসলমান সন্ত, শিখ গুরুদের চারজন শিষ্য, এগারো জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শ্লোক বা গাথা এই পবিত্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৭০৮ সালের ৭ই অক্টোবর দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিং এই পবিত্র গ্রন্থকে শিখদের পরবর্তী এবং চিরস্থায়ী গুরু হিসাবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে 'গুরু গ্রন্থ সাহিব' নামটি চালু হয়, 'আদি গ্রন্থ' নামেও যার পরিচিতি। স্বভাবত, শিখধর্মে গুরু পদটি লোপ পায়। শিখধর্মে নানক ব্যতীত অপর নয়জন গুরু হলেন অঙ্গদ, অমর দাস, রামদাস, অর্জন দেব, হরগোবিন্দ, হর রাই, হরকিষণ, তেগবাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ। শিখধর্মের উপাসনার ক্ষেত্রে প্রধান সহায় বা সূত্র হিসাবে এই গ্রন্থের স্থান সবার আগে। দশম গুরু প্রয়াত হওয়ার পর বাবা দীপ সিংহ বিতরণের জন্য এই গ্রন্থে একাধিক সম্পাদিত নকল প্রস্তুত করেছিলেন। পঞ্চম গুরু হরগোবিন্দ স্বর্ণমন্দিরে গ্রন্থসাহিব-এর আনুষ্ঠানিক পাঠের জন্য 'গ্রন্থী' নামে একটি পদ সৃষ্টি করেন। বাবা বুধাকে তিনি প্রথম গ্রন্থী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

শিখধর্মের ইতিহাস বিশাল এবং ব্যাপক। এটি একটি সর্বেশ্বরবাদী ভারতীয় ধর্ম। এই স্বল্প পরিসরে বাবা নানক তাঁর প্রবর্তিত শিখ ধর্ম এবং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। আজ সাড়ে পাঁচশো বছর হলো সমন্বয়ের বাণী নিয়ে শিখধর্ম বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্রসারিত হয়েছে। শুধুমাত্র গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষার মানুষ নন, বিশ্বের নানা ভাষার মানুষের মধ্যেও এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, এই পবিত্র গ্রন্থটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় প্রায় এক পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ বাংলাভাষী শিখধর্ম পালন করেন। বহুদিন ধরে বাংলা অনুবাদ না থাকায় বাঙালি শিখেরা তাঁদের প্রিয় ধর্মগ্রন্থের মর্ম আস্বাদন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই অবস্থার প্রথম পরিবর্তন ঘটালেন সুরেন্দর জিৎ সিং। তিনি মূল 'গ্রন্থসাহিব'-এর গুরুমুখী লিপি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করলেন। এর ফলে বাঙালি শিখেরা কিছুটা আত্মীয়তা অনুভব করলেন মূল গ্রন্থের সাথে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি বহু ধর্মভীরু মুসলমান আছেন যিনি আরবী হরফের সাথে আদৌ পরিচিত নন। বলতেও জানেন না। অথচ তিনি পবিত্র কোরানের মূল সূক্তগুলি অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন, আবৃত্তি করে পারেন নির্ভুলভাবে। হিন্দুদের অনেকেই একইভাবে গীতা বা পুরাণ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

কল্পনা করা যায় সুরেন্দর জিৎ সিং-এর এই রূপান্তর হস্তগত হবার পর একজন বাঙালি শিখ তাঁর প্রার্থনার মুহূর্তে কিভাবে এটি উপভোগ করবেন ! ধর্মপ্রাণ শিখ জানেন সূর্যোদয়ের পর প্রভাতী প্রার্থনা হলো গ্রন্থসাহিব-এর প্রথম স্তবকের 'জপজি' স্তোত্র পাঠ করা। এখন তিনি গুরুমুখী ভাষার প্রার্থনা বাংলা হরফে পাচ্ছেন।

"সৌচী সোচি ন হোবঈ জে সোচি লখবার
চুপৈ চুপ ন হোবঈ জে লাই রহা লিব তার।"

এটি তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারেন।

বহুদিন পরে ধর্মপ্রাণ বাঙালি শিখদের এই প্রত্যাশার অবসান ঘটলো গত ২০১৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এদিন কলকাতার গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের ইন্‌স্টিটিউট অফ কালচার-এর একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের এক পবিত্র আকর গ্রন্থ 'বাবা গ্রন্থসাহিব'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বইটি প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন "এই বই পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশে এবং দুনিয়ার অন্যত্র ত্রিশ কোটি বাঙালির কাছে পৌঁছে যাবে।"

দীর্ঘ চার বছর ধরে অনুবাদ করে পাঁচ খণ্ডে 'আন্তধর্মীয় সংস্কৃতির সংলাপ', 'জাতীয় সংহতির প্রতীক' গুরু গ্রন্থসাহিবকে বাংলায় রূপান্তরিত করলেন মুম্বই প্রবাসী এক বাঙালি দম্পতি ঝুমা ঘোষ এবং চয়ন ঘোষ। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন হিমাচল প্রদেশের সোলান-এর অধিবাসী শ্রী লছমন কেল্লারাম।

বাংলায় 'গ্রন্থসাহিব' প্রকাশের সাথে সাথে বাংলাভাষী মানুষের কাছে নানক-জীবনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে প্রকাশ ঘটেছিল তার ক্রমিক বিকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু নানক নন, দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ গুরুদের অধ্যাত্মভাবনা এবং জীবনদর্শনের একটা সামগ্রিক বর্ণনা এই ধর্মগ্রন্থে আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবনার সাধক কবিদের স্তোত্র, গাথা এবং রচনার অংশবিশেষও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

গুরু গ্রন্থসাহিব-কে অনুসরণ করে বাবা নানকের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষব্যাপী যে ভক্তি আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল সেই আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের অন্যতম একজন ছিলেন গুরু নানক। ভক্তি আন্দোলনের ধর্মগুরুগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কবীর বলতেন 'যিনিই রাম তিনিই রহিম'। চৈতন্যদেব বললেন যাগ, যজ্ঞ,পূজা অর্চনা নয়, শুদ্ধচিত্তে হরিনাম করো, তাতেই মুক্তি হবে। মানব সংসারে দুটি প্রধান ধর্ম খ্রীশ্চান এবং ইসলাম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

গুরু গ্রন্থসাহিব-এর প্রথম অধ্যায় 'জপজী বা জপু'র চতুর্থ সূক্তে আছে ---

"নানক এবৈ জানীঐ সভু আপে সচি আরু।(৪)
"সুঅসতী আথী বাণী বরমাউ।" ("I bow to the Lord of the world, to his word to Brahma.")

'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। একম্ + এব + অদ্বিতীয়ম্ —এক ও অদ্বিতীয়। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অমোঘ এই বেদবাক্য। হিন্দুদের একাংশ, খ্রীস্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মরাও এই দর্শনে বিশ্বাস করেন। নানকের বড় অবদান হলো তিনি তাঁর সংগঠিত সমাজে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। সেকালের ভারতীয় সমাজে এরকম একটি মত প্রতিষ্ঠা করা হলো একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত।

ভক্তি আন্দোলনের অন্যান্যদের মতো নানকও হিন্দুধর্মের মৌলিক (fundamental) চিন্তা ভাবনাকে আঘাত করেননি। তিনি বলেছেন—

"গুরু ঈসরু গুরু গোরখু বরমা গুরু পারবতী মাঈ।।"

("The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma, the Guru is Parvati and Lakshmi")

তিনি এবং সকল শিখ গুরুই 'গুরু'র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আত্মোপলব্ধি ঈশ্বরোপলব্ধির নামান্তর, যা কেবলমাত্র গুরুর কৃপায় অর্জন করা সম্ভব।

তিনি আরও বললেন —

"গুরা ইক দেহি বুঝাঈ
সভনা জীয়া কা ইকু দাতা সো মৈ বিসরি না জাঈ।"

("The Guru has given me this understanding : there is only one / The Giver of all souls, May never forget.")

গুরু নানক শিখধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। 'শিখ' শব্দের অর্থ হলো 'শিষ্য', স্পষ্ট করে বলা যায় 'অনুগামী', যিনি সর্বদা জ্ঞানান্বেষী এবং আত্মোন্নয়নে আগ্রহী। গুরু নানক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছেন, ভালোবেসেছেন কিন্তু কোনো দেবদেবীর মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেননি, কোনো ভাস্কর্যের প্রতি পূজাদানে আগ্রহ দেখাননি। একটা সমাজের সংস্কারে, নতুন সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে রূপান্তর আনে। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এই চিন্তা ছিল বৈপ্লবিক। তিনি বেদ বা পুরাণের কোনো স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু এইসব গ্রন্থের যে সব প্রগতিশীল ভূমিকা আছে সেগুলি গ্রহণ করেছেন।

বেদ পুরাণের আমল থেকে ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা সমগ্র জাতিকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে, শতধা বিদীর্ণ করেছে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারকে। সমাজের সার্বিক কল্যাণে, সমাজকে আরও বেশি প্রগতিশীল, মানবিক করে তোলার জন্যে বাবা নানক এগুলি তাঁর ধর্মমত থেকে সযত্নে পরিহার করেছিলেন। তাইতো তিনি বলতে পেরেছেন ---

"There is no Hindu, no Musalman."

কী অসাধারণ ছিল তাঁর দার্শনিক শিক্ষা। তিনি শুধু সাধু সন্তদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলেননি, বলেছেন এই ধরিত্রী, আকাশ, বাতাস, সাগরের বাণী

শুনতে। এমন কি নিম্নতর পৃথিবীর কথা শুনতে।

"সুনিঐ সিধ পীর সুরুনাথ।।
সুনিঐ ধরত ধবল আকাশ।।
"সুনিঐ দীপ লোঅ পাতাল।।"

("Listening-the Siddhas, the spiritual teacher, the heroic warriors, the Yogic masters.

Listening-the earth, its support and the Akashic ethers.

Listening-the oceans, the lands of the world and the nether of the underworld.)

গুরু নানক যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান অর্জন করেছেন সেটা শুধু পাঞ্জাব বা ভারতবর্ষে নয়, এই বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জগতের অন্যতম একজন ধর্ম প্রবক্তা। তিনি মানবজাতিকে শিখিয়েছেন ভালোবাসার সুসমাচার। নূতন করে হৃদ্যতা স্থাপনের মন্ত্র। তিনি নানাভাবে পাঞ্জাবের সমাজজীবন, পাঞ্জাবের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় পাঞ্জাবের মানুষকে যেভাবে দেখেছিলেন, তার তুলনায় তাদের অনেক বেশি রূপান্তর ঘটিয়েছেন। শুধু পাঞ্জাব কেন, তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমনকি বহির্ভারতেও প্রসারিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষায় মানুষ বিশ্বাস, ভগবৎ ভক্তির মহত্তর স্তরে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে পাঞ্জাবের মানুষের। তাদের পূজা-পার্বণ, আচার অনুষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে। জাতিভেদ প্রথার মতো ঘৃণ্য সামাজিক পাপ উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের মানসিক মুক্তি ঘটার ফলে আজ তারা উন্নয়নের পথে এক অগ্রবর্তী জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। গুরু নানক এবং তাঁর অনুবর্তী গুরুরা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে এই জাতিকে এক কর্মঠ, যোদ্ধ্ জাতিতে পরিণত করেছেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সব রকম সংকীর্ণ প্রভাব পাঞ্জাব থেকে দূরীভূত হয়েছে। শিখধর্ম এখন একটি সংবেদনশীল ধর্মে পরিণত হয়েছে।

পরিশেষে দু'জন শিখ গুরুর কথা উল্লেখ না করলে নয়। এঁরা হলে গুরু অর্জন দেব এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ্। গুরু অর্জন অমৃতসর শহরের পত্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনে এর চেয়ে মূল্যবান কাজ, 'আদিগ্রন্থ' —যাকে শিখদের 'বাইবেল' বলা হয়, তার সংকলন। এই মহান গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমালোচক খুশবন্ত সিং বলেন —

"The Granth is a unique historical document . It is perhaps, the only kind of writing of a scriptural nature which has preserved without establishment or misconstruction of the original writings of the religious literatures. It has served the literary works of other poets of the time from the vagaries of human memory. The Granth

Sahib is the central object of Sikh worship and ritual."

তিনি আরও বলেন —

"The Granth Sahib is not like the idol in a Hindu Temple, or the Cross in a Catholic Church. It is the source and not the object of prayer or worship. Sikhs revere it because it contains the teachings of their Gurus. It is more a book of divine wisdom than the work of God."

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটি সংকলিত হয়। এর প্রায় একশো বছর পরে গুরু গোবিন্দ সিংহ এই গ্রন্থকে গুরুর মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করলেন 'গ্রন্থসাহিব' হলেন শেষ গুরু এবং একাদশ গুরু। এই গ্রন্থের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মপালন, সমাজজীবন, সেবাবৃত্তি পালিত হবে। দশম গুরু তাঁর বাবা গুরু তেগ বাহাদুরের কাছে শান্তি ও যুদ্ধ দুয়েরই শিক্ষা পেয়েছিলেন। গুরু পদ অর্জনের পর তিনি দেখলেন তাঁর শিষ্যরা সব মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত এবং মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার যোগ্যতা ও বাহুবল দুই-ই হারিয়েছে। তিনি তাঁর শিষ্যদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন, শিখবাহিনীকে সুদৃঢ় করার জন্য বাহিনীতে পাঠানদের নিয়োগ করলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ যথেষ্ট যোগ্য এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক ছিলেন। ১৬৯৯ সালের 'বৈশাখী' দিবসে তিনি 'খালসা' বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে শিখরা ধূমপান ত্যাগ করে এবং পঞ্চ 'ক' ধারণ করেন। এই পঞ্চ 'ক' হল কেশ, কচ্ছ, কঙ্কন, কৃপাণ এবং কঙ্কতিকা। তিনি শিখদের স্বাতন্ত্র্য দিলেন, তাঁর আগে পর্যন্ত শিখদের হিন্দুধর্মের একটি স্বতন্ত্র শাখা বলে মনে করা হতো।